Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়:

কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহসীন রাইসা

রোলঃ 216022407

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়:

কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহসীন রাইসা

রোলঃ 216022407

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহসীন রাইসা, আইডি: 216022407 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ ২৬ মে, ২০২৪ ইং

তাহসীন রাইসা

আইডিঃ 216022407

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 6

শবে বারাআত কি? 7

লাইলাতুল বারাআত পরিচিতি: 7

হাদিসে শবে বারাআত: 10

উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বারাআত: 12

হাদিসের আলোকে শবেবরাতের ফজীলত ও আমলসমূহ: 13

এ রাতে হায়াত-মউত ও বার্ষিক বাজেটের ফয়সালা হয়: 14

সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা: 15

শবে বরাতে রসূলের দীর্ঘ সিজদায় নফল নামায আদায়: 18

শবে বরাতে দু'আ ও তওবার মাধ্যমে গুনাহের মার্জনা: 20

শবে বরাতে নবীজীর (সঃ) কবরস্থান গমন: 21

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়ঃ 23

পরদিন রোযা রাখা: 25

রাত্রে জাগরণ করে নির্জনে ইবাদত করা: 27

রাতের কোন অংশে জাগ্রত থাকা উত্তম: 29

শবে বরাতে কবরস্থানে গমন: 31

সংঘটিত কিছু বিদআত ও কুসংস্কারঃ 33

আতশবাজী: 34

আলোকসজ্জা: 34

হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি ইত্যাদি: 36

শবে বরাতের রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত: 37

শবে বরাতেও যাদের ক্ষমা করা হয় না: 38

শবে বরাত-কেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি: 40

শবে বরাত কেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি: 42

শবে বরাত কেন্দ্রিক ছাড়াছাড়ি: 43

শবেবরাত কেন্দ্রিক মধ্যপন্থা: 43

উপসংহার: 44

রেফারেন্স: 46

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা:

আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন ধারা অনুযায়ী এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, নির্দিষ্ট সময়কে অন্য সময়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য দান করেছেন। মাহে রমযান সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুমহান। জুমার দিন অন্য দিনের তুলনায় মর্যাদাবান। অন্যান্য স্থানের উপর মক্কা-মদীনার অধিক সম্মান। অনুরূপভাবে শবে কদরের পরে অন্যান্য রজনীর চেয়ে শবে বরাতের স্থান। ফযীলত ও বরকতময় মাসসমূহের একটি হল শা'বান মাস। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পুরো শা'বান মাসই রোযা রাখতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ১৯৬৯, ১৯৭০)

এ মাসে বনী আদমের আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন, তাঁর আমল এমন সময় পেশ হোক যখন তিনি রোযাদার। (নাসায়ী শরীফ হাদীস নং- ২৩৫৭) শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্র (অর্থাৎ, ১৫ শা'বানের রাত্র) মুসলিম সমাজে 'শবে বরাত' বা 'লাইলাতুল বরাআত' হিসেবে প্রসিদ্ধ। হাদীস শরীফে এ রজনীকে ليلة النصف من شعبان বা 'অর্ধ শা'বানের রাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'লাইলাতুল বরাআত' নামটিও হাদীস শরীফের মর্মার্থ থেকেই গৃহীত। অর্থাৎ, মুক্তির রজনী। আজকাল শবে বরাত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কেউ এর গুরুত্ব বর্ণনা করছেন। আবার কেউ এর অস্তিত্বকেই পুরোদমে অস্বীকার করছেন। আবার কেউ আমলের নামে এমন সব কাজও করছেন, যা কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

শবে বরাতকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত এবং রসম-রেওয়াজের অনুসরণে তৃপ্ত। আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা পরিলক্ষিত। তাদের দাবি হল, 'ইসলামে শবে বরাতের কোন ধারণা নেই। এ ব্যাপারে যত বর্ণনা আছে সব জাল বা দুর্বল।' তারা এসব বক্তব্য সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরি করে মানুষের মধ্যে বিলি করছে।

বাস্তব কথা হল, বাড়াবাড়ির পথটিও সঠিক নয় এবং ছাড়াছাড়ির মতটিও শুদ্ধ নয়। কেননা শরীয়তে ছাড়াছাড়ির যেমন অবকাশ নেই, তেমনি বাড়াবাড়িরও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইসলাম ভারসাম্যতার দ্বীন এবং এর সকল শিক্ষাই প্রান্তিকতা মুক্ত সরল পথের নির্দেশনা

দেয়। এখানে এ রজনী সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা

শবে বারাআত কি?

"শব" শব্দটা ফার্সি। যার অর্থ হল-রাত। আর বারাআত এটি আরবী শব্দ। মূলত হল-براءت যার অর্থ হল "মুক্তি" তথা জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত হল শবে বারাআত।
শবে বারাআতকে হাদিসের পরিভাষায় বলা হয়েছে "লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান" (ليلة النصف من شعبان) তথা শাবানের অর্ধ মাসের রাত। কেউ কেউ "শবে বারাআত" নামে হাদিসে শব্দ না থাকায় এ রাতকে অস্বীকার করার মত খোড়া যুক্তি দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আমি বলি-আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া আবশ্যক বলি কুরআন হাদিসে বর্ণিত নির্দেশের কারণে। কিন্তু কুরআন হাদিসের কোথাও কি নামায শব্দ আছে? তাওহীদ কে আমরা ঈমানের শর্ত বলি। কিন্তু কুরআন হাদীসের কোথাও তাওহীদ শব্দ নেই। তাই বলে কি তাওহীদ কুরআন হাদিস দিয়ে প্রমাণিত নয়? আমরা যাকে নামায বলি সেই অর্থবোধক কুরআন হাদিসের উদ্ধৃত শব্দ "সালাত"ই হল নামায। আমরা যাকে তাওহীদ বলি কুরআন হাদিসের একত্ববাদ প্রকাশক সকল শব্দই হল এ তাওহীদ। তেমনি আমরা যাকে "শবে বারাআত" বলি তথা শাবানের পনের তারিখের রাত বলে থাকি এই অর্থবোধক শব্দ হাদিসে পাওয়া গেলে তা'ই হবে শবে বারাআত। আর এই অর্থবোধক হাদিসে বর্ণিত শব্দ হল "লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান"। সুতরাং তাই হল শবে বারাআত।

লাইলাতুল বারাআত পরিচিতি:

১। বার মাস সম্বলিত আরবী বছরের ৮ম মাস হচ্ছে মাহে শা'বান। যা রমজানের পূর্ববর্তী সময়ে অবস্থিত। এ শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে ফার্সী ভাষায় শবে বরাত বলা হয়। ফার্সীতে শব অর্থ রাত/রজনী; বরাত অর্থাৎ ভাগ্য। শবে বরাত অর্থাৎ ভাগ্যরজনী। আরবী ভাষায়ও বরাত শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে তখন উচ্চারণ হবে বারাআত। আর শব শব্দের আরবী অনুবাদ (প্রতিশব্দ) হলো লাইলাতুন। কাজেই ভাষারীতির আলোকে বলতে হবে ليلة البراءة "লাইলাতুল বারাআত " বা পরিত্রাণের রজনী।

২। এ রাতকে কুরআনের ভাষায় (মুফাসসিরীনের একটি দলের মতানুসারে) " লাইলাতুল মুবারাকাহ " (ليلة مباركة) বরকতময় রাত এবং হাদিসের ভাষায় " লাইলাতুন নিসফি মিন

শাবান ” (ليلة النصف من شعبان) অর্থাৎ শাবান মাসের মধ্যরাত্রি বলা হয়।

৩। তাফসীর গ্রন্থে এর আরো নাম পাওয়া যায়।
যেমনঃ
ক) (ليلة الرحمة) লাইলাতুর রাহমাহ অর্থাৎ রহমত অবতীর্ণ হওয়ার রজনী

খ) (ليلة الصك) লাইলাতুসসাক অর্থাৎ দলীল দস্তাবেজের রজনী

গ) (ليلة البراءة) লাইলাতুল বারাআত তথা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের রজনী

৪। মূলতঃ যে বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা –

ক) বহুসংখ্যক সলফে-সালেহীনের অনেকের অঙ্কিত নাম অনুসারে “ শবে বরাত ”

খ) মুফাসসিরীনদের ভাষ্য মতে “ লাইলাতুল বারাআত ”

গ) হাদীসের ভাষ্য মতে “লাইলাতুন নিসফি মিন শা’বান ” (মধ্য শাবানের রাত্র)হিসেবে সুপরিচিত।

৫। যেহেতু মধ্য এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ এলাকায় এক সময় ফার্সী ভাষার সর্বাধিক প্রচলন ছিল বিধায় এ পবিত্র রজনীটি ফার্সী ভাষা অনুযায়ী “ শবে বরাত ” নামে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ জন্য আমরা এটাকে সাধারণতঃ “ শবে বরাত ” বলে থাকি।

কাজেই এখানে একটি বিষয় অতি পরিষ্কার যে, “ শবে বরাত ” আরবী নয় বরং ফার্সী শব্দ। এ জন্য শব্দটি কুরআন ও হাদিস উভয়ের মাঝে উল্লেখ থাকার প্রশ্নই আসে না। যেমনঃ নামায, রোজা, দরূদ এর ব্যবহার কুরআন হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তদস্থলে সালাত, সিয়াম ইত্যাদি আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি শবে বরাত শব্দটি কুরআনে হাদিসে নেই বলে এটা অমান্য করতে চায় বা বিদআত বলতে চায় তাহলে নামায, রোজা,

দরূদ শরীফকেও তাদের বিদআত বলতে হবে। কেননা এসব শব্দ ফার্সী হওয়ায় কুরআন-সুন্নাহ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

৬। অতএব নির্দ্বিধায় বলতে হবে, মধ্য এশিয়ার ওলামাদের পরিভাষায় এটা " শবে বরাত " হলেও তার আসল নাম –

ক) হাদিসের পরিভাষায় ليلة النصف من شعبان " লায়লাতুন নিসফি মিন শা'বান " (মধ্য শাবানের রাত্রি)

খ) তাফসীরের ভাষায় ليلة الصك " লাইলাতুসসাক " ليلة الرحمة " লাইলাতুর রাহমাহ " ليلة البراءة " লাইলাতুল বারাআত "কেই বুঝানো হয়েছে।

৭। আল্লাহ তাআলা শা'বান মাস ও তার পনের তারিখের রজনীকে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য রহমত ও বরকত স্বরূপ ও গুনাহ মার্জনার মৌসুম বলে অভিহিত করেছেন। শবে বরাতও এরই ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলা পুরো বছরই শেষ রাতে বান্দার গুনাহ মার্জনা করে থাকেন বলে ' হাদিসে-নুযূলে ' উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শবে বরাত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, তিনি সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরো রাতই বিশেষ রহমত ও ক্ষমার আহবান করতে থাকেন। যেমনটি করেন শবে ক্বদরে। তাফসীর গ্রন্থে বিশেষ দিন-রাত্রের মর্যাদার কারণ হিসেবে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য নবী-রাসূল এর উম্মতগণ হাজার-বারশত বছরের হায়াত পেয়ে দীর্ঘকাল ইবাদত করে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পেতো। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদিয়া সাধারণত হায়াত পেয়ে থাকে ৬০ থেকে ৭০ বছর, অথচ এরা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সুতরাং এ স্বল্প সময়ের ইবাদতকে এরা যেন দীর্ঘ সময়ের ইবাদতের চেয়েও অধিক পূণ্যবান করে সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারেন এ লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বিশেষ কিছু সময়, মাস, দিন রাতকে বরকতপূর্ণ করে এমন মর্যাদাশীল করেছেন যাতে এ বিশেষ সময়গুলোতে এ উম্মত তওবার মাধ্যমে আপন গুনাহসমূহ হতে মুক্তি পেতে সক্ষম হয় এবং হাজার হাজার বছর ইবাদত করে জান্নাত অর্জনকারী অন্যান্য উম্মতের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পায়। (তাফসীরে সূরা ক্বদর)

হাদিসে শবে বারাআত:

কুরআনে শবে বারাআতের কোন উল্লেখ নাই। কুরআনে কেবল "লাইলাতুল কদর" তথা "শবে কদর" এর কথা উল্লেখ আছে। পবিত্র কুরআনের পঁচিশ নাম্বার পারার সূরায়ে দুখানের ২ ও ৩ নং আয়াতে বর্ণিত মুবারক রজনী দ্বারা লাইলাতুল কদর তথা শবে কদর উদ্দেশ্য, শবে বারাআত নয়। এটাই বিশুদ্ধ বলেছেন গ্রহণযোগ্য মুফাসসিরীনে কেরাম। যার পক্ষে যুক্তিও শক্তিশালী। বিস্তারিত -

১.আদ দুররুল মানসুর-৭/৪০১-৪০৭

২.তাফসীরে কাশশাফ-৪/২৭২

৩.তাফসীরে ইবনে কাসীর-৭/২৪৬

৪.তাফসীরে বাগাভী-৭/২২৭-২২৮

বিভিন্ন হাদিসে শবে বারাআতের বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم) إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر(

হযরত আলী বিন আবু তালীব রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- যখন শাবান মাসের অর্ধেকের রজনী আসে [শবে বরাত] তখন তোমরা রাতে নামায পড়, আর দিনের বেলা রোযা রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ এ রাতে সূর্য ডোবার সাথে সাথে পৃথিবীর আসমানে এসে বলেন-কোন গোনাহ ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি আমার কাছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন রিজিকপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিজিক দিব। কোন বিপদগ্রস্থ মুক্তি পেতে চায় কি? আমি তাকে বিপদমুক্ত করে দিব। আছে কি এমন, আছে কি তেমন? এমন বলতে থাকেন ফযর পর্যন্ত। {সূনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-১৩৮৮, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৮২২}

عن عائشة : قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال إن الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

অনুবাদ- হযরত আয়শা রাঃ বলেন-এক রাতে রাসূল সাঃ কে না পেয়ে খুঁজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে [মদীনার কবরস্থান] গিয়ে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন- কী ব্যাপার আয়শা? [তুমি যে তালাশে বের হলে?] তোমার কি মনে হয়

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর কোন অবিচার করবেন? [তোমার পাওনা রাতে অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়ে রাত্রিযাপন করবেন?] হযরত আয়শা রাঃ বললেন- আমার ধারণা হয়েছিল আপনি অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়েছেন। রাসূল সাঃ তখন বললেন- যখন শাবান মাসের ১৫ই রাত আসে অর্থাৎ যখন শবে বরাত হয়, তখন আল্লাহ পাক এ রাতে প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তারপর বনু কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে বেশী সংখ্যক বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। {সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-৭৩৯, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৬০২৮, মুসনাদে আব্দ বিন হুমাইদ, হাদীস নং-১৫০৯}

যেহেতু আমাদের মাঝে কেউ কেউ এ রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করে থাকেন। তাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অন্ধভাবে মান্যবর ব্যক্তিত্ব শায়েখ নাসীরুদ্দীন আলবানী রহঃ তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আস সিলসিলাতুস সাহিহাহ আল মুজাল্লাদাতুল কামিলাহ" গ্রন্থে ৩ নং খন্ডে ১১৪৪ নং অধ্যায়ে ২১৮ নাম্বার পৃষ্ঠায় শবে বারাআত সম্পর্কে হাদিস এনে যে দীর্ঘ আলোচনা করে যে মত ব্যক্ত করেছেন তা তুলে ধরা হল-

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال) : يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن(

অনুবাদ-হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন- অর্ধ শাবানের রাতে [শবে বরাতে]আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত মাখলুকের প্রতি মনযোগ আরোপ করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেন। {সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫৬৬৫, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-২৭৫৪, মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াই, হাদীস নং-১৭০২, আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং-৬৭৭৬, আল মুজামুল কাবীর, হাদীস নং-২১৫, সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস নং-১৩৯০, মুসনাদুশ শামীন, হাদীস নং-২০৩, মুসন্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩০৪৭৯, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৬২০৪}

আলবানী রহঃ তার সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩ নং খন্ডের ১৩৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন। "এই হাদিসটি সহীহ" এটি সাহাবাদের এক জামাত বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সূত্রে যার একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করেছে। তাদের মাঝে রয়েছেন- মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ, আবু সা'লাবা রাঃ, আব্দুল্লাহ বিন আমর রাঃ, আবু মুসা আশয়ারী রাঃ, আবু হুরায়রা রাঃ, আবু বকর সিদ্দীক রাঃ, আউফ বিন মালিক রাঃ, আয়েশা রাঃ প্রমুখ সাহাবাগণ।

উপরে বর্ণিত সবক'টি বর্ণনাকারীর হাদিস তিনি তার কিতাবে আনার মাধ্যমে সুদীর্ঘ আলোচনার পর শেষে তিনি বলেন-

و جملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب و الصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث ، فما نقله

الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في " إصلاح المساجد) " ص (١٥٧ عن أهل التعديل
و التجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح ، فليس مما ينبغي
الاعتماد عليه ، و لئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل
التسرع و عدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك . و الله تعالى هو الموفق

অর্থাৎ "সারকথা হল এই যে, নিশ্চয় এই হাদিসটি এই সকল সূত্র পরম্পরা দ্বারা সহীহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সহীহ হওয়া এর থেকে কম সংখ্যক বর্ণনার দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে যায়, যতক্ষণ না মারাত্মক কোন দুর্বলতা থেকে বেঁচে যায়, যেমন এই হাদিসটি হয়েছে। আর যা বর্ণিত শায়েখ কাসেমী থেকে তার প্রণিত "ইসলাহুল মাসাজিদ" গ্রন্থের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় জারাহ তা'দীল ইমামদের থেকে যে, "শাবানের অর্ধ মাসের রাতের কোন ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদিস নেই মর্মে" সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবেনা। আর যদি কেউ তা মেনে নেয় সে হবে ঝাঁপিয়ে পড়া(ঘারতেড়া) স্বভাবের, আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উদ্ভাবনের কোন যোগ্যতাই নেই এরকমভাবে যেমন আমি করলাম"।
শায়েখ আলবানী রহঃ এর বিশ্লেষণ থেকে একথা নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি হাদিস দ্বারা শবে বারাআত প্রমাণিত।

উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বারাআত:

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ৭২৮ হি.)

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সর্ম্পকে একাধিক 'মারফূ' হাদীস ও 'আসারে সাহাবা' বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা ওই রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এ রাতের নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে।

কোনো কোনো আলেম যদিও এই রাতের ফযীলত অস্বীকার করেন; কিন্তু হাম্বলী ও গায়রে হাম্বলী অধিকাংশ আলেমই এই রাতের ফযীলতের কথা স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সালাফ (সাহাবী ও তাবেয়ী)-এর 'আসার'ও বিদ্যমান আছে; যেগুলো 'সুনান' ও 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলিত হাদীসের কিতাবে [বরং কতক 'সহীহ' শিরোনামের

কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতিতে] রয়েছে।

হাদিসের আলোকে শবেবরাতের ফজীলত ও আমলসমূহ:

শবে বরাআতের ফযীলত সম্পর্কে কতিপয় হাদিস:

- হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শা'বানের রাতে (শা'বানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে) মাখলূকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত আর সবাইকে ক্ষমা করে দেন। -সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং- ৫৬৬৫, আলজামেউস সগীর পৃ: ৪৪৪, মুসনাদে বাযযার হাদীস নং- ২০৪৮, ইবনে খুযাইমা কিতাবুত তাওহীদ পৃ: ১৩৬, ইবনে মাযা হাদীস নং- ১৩৯০

- আল্লাহ তা'আলা এ রাতে বিদ্বেষ পোষণকারী ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যাকারী ছাড়া সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। মুসনাদে আহমদ ৪/১৭৬

- এ রাতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও ব্যভিচারিনী মহিলা ব্যতীত সকলেরই চাওয়া পূরণ করে থাকেন। শু'আবুল ঈমান ৩/৩৮৩

- যখন অর্ধ শা'বানের রাত্রি আসে তখন আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। অত:পর মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, কাফেরদেরকে (ফিরে আসার) সুযোগ দেন এবং হিংসুকদেরকে হিংসা পরিত্যাগ ব্যতীত ক্ষমা করেন না। শু'আবুল ঈমান ৩/৩৮২

- এটা হল অর্ধ শা'বানের রাত। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোযোগ দেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেন। শু'আবুল ঈমান ৩/৩৮২
- নবীজী সা. এ রাতে জান্নাতুল বাকীতে এসে মৃতদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করেছেন। এরপর হযরত আয়েশা রা.কে বললেন, এ রাতে আল্লাহ তা'আলা কালব

গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও বেশি লোককে ক্ষমা করে দেন। তিরমিযী হাদীস নং- ৭৩৯

এ রাতে হায়াত-মউত ও বার্ষিক বাজেটের ফয়সালা হয়:

হযরত আয়েশা (রঃ) হযরত নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন: শবে বরাতে কি ঘটে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রঃ) রসূল (সঃ) থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই রাতের কার্যক্রম হলো এই বছর যত (সন্তান) জন্মগ্রহণ করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এই বছর যত (লোক) ইন্তেকাল করবে তা লিখা হয়। আর এই রাতেই বান্দাদের (সারা বছরের) কার্যাবলী (আসমানে) উঠানো হয় আর এই রাতেই নির্ধারিত রিযিক অবতীর্ণ হয়। তারপর আয়েশা (রঃ) জানতে চাইলেন যে হুজুর! আল্লাহর রহমত ও করুণা ছাড়া কেউ কি বেহেশতে যেতে পারবে? রসূল (সঃ) তিনবার বলেনঃ কখনো পারবে না। আয়েশা (রঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ হুজুর! আপনিও না? জবাবে বললেনঃ আমিও একমাত্র তার দয়া ও রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না (তিনবার বললেন)। (মিশকাত শরীফ)

হযরত আতা বিন ইয়াসির (রঃ) হতে বর্ণিত:

যখন শাবানের পঞ্চদশ রজনী আগত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে মালাকুল মউতকে একটা তালিকা দেয়া হয় এবং হুকুম করা হয় যে, এই তালিকায় যেসব মানুষের নাম লিপিবদ্ধ আছে তাদের প্রাণ হরণ কর। কোন বান্দা বাগিচায় গাছপালা লাগাচ্ছে, কেউ বিবাহ করছে, কেউ বা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত আছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লেখা হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকঃ খ - ৪, পৃ - ৩২৭)

শবে বরাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ), মুআয বিন জাবাল (রঃ), আমর বিন আস (রঃ), আবু মূসা আশআরী (রঃ), আবু হুরায়রা (রঃ), আউফ বিন মালেক (রঃ), কাছীর বিন মুররাহ (রহঃ) সহ বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইতিপূর্বে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে প্রায় সবগুলোর সারাংশ হলোঃ

নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা শাবানের পনেরতম রাত্রে প্রথম

আসমানে অবতরণ করেন এবং এই রজনীতে সকলকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন কেবল মাত্র মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।

অগণিত মুসলমানকে ক্ষমা করা হয় এ রাতে:

হযরত আয়েশা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যার একাংশ হলো:

রসূল (সঃ) বলেনঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তাআলা শা'বানের পনেরতম রজনীতে প্রথম আসমানে শুভাগমন করেন এবং কালব গোত্রের বকরীগুলোর পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন। (তিরমিযী)

সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা:

হযরত আলী (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে দেখা যায় যে, অন্যান্য রজনীতে রাতের শেষাংশে গুনাহ মাফের আহবান করা হয় কিন্তু শবে বরাতের বৈশিষ্ট্য যে, সূর্যাস্ত থেকে সারারাতব্যাপী এ আহবান বলবৎ থাকে:

হযরত রসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, যখন শা'বানের পঞ্চদশ রজনী আগত হয় তখন রাতে নামায পড় এবং পরবর্তী দিনে রোযা রাখ। কেননা সূর্যাস্ত হওয়ার সময় হতে সুবহে সাদিক (ফযর) উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং এ আহবান করতে থাকেনঃ আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? আছে কি কোন রিযিক যাচনাকারী, আমি তাকে রিযিক দেব? আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে বিপদ হতে পরিত্রাণ দেব? আছে কি কোন এমন কেউ, এমন কেউ ইত্যাদি।(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

শবেবরাতে রাত জাগরণের নির্দেশ:

হযরত আলী (রঃ) হতে বর্ণিত উক্ত হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে জাগ্রত থেকে অধিক হতে অধিক ইবাদত করাও মুস্তাহাব, রাত জেগে

নফল নামায আদায় করুন, কুরআন তিলাওয়াত করুন, দুআ ও ইস্তিগফার করুন। এ কারণে হাদিসে গবেষণা করলে দেখা যায় শবেবরাতে স্বয়ং রসূল (সঃ)ও রাত জাগরণ করেছেন অন্যদেরকেও রাত জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন বরং রাত জাগরণের ফযীলতও বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত্রে জাগ্রত থাকবে তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। ১. যিলহজ্জের অষ্টম রাত
২. যিলহজ্জের নবম রাত্র
৩. ঈদুল আজহার রাত
৪. ঈদুল ফিতরের রাত
৫. শাবানের পঞ্চদশ রজনী।
(মুনযিরী রচিত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-২, পৃ-১৫২)

এ কারণেই ফিকহের ইমামগণের অনেকে শাবানের পঞ্চদশ রাতে জাগরণ থাকাকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইবনে উমর (রঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ

হযরত ইবনে ওমর (রঃ) বলেনঃ পাঁচটি রজনীতে দুআ করা হলে তা কখনো ফেরত দেয়া হয় না (অবশ্যই ক্ববুল হয়) জুমআর রাত্র, রজবের প্রথম রাত, শাবানের পঞ্চদশ রাত এবং দুই ঈদের রাত। (ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসনাদে)

<u>মাহে শা'বান এবং শাবানের পঞ্চদশে রোযা রাখার গুরুত্ব:</u>

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়েস (রহঃ) হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণনা করেনঃ
" রসূল (সঃ) এর নিকট নফল রোযার জন্য অন্যান্য মাসের তুলনায় শাবান মাস ছিল অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর তিনি শাবানের রোযাকে রমজানের সাথে মিলিয়ে দেয়াকে আরও বেশী পছন্দ করতেন। " (আবু দাউদ)

হযরত উসামাহ বিন যাইদ (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উসামা (রঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সঃ), আমি আপনাকে রমজান ছাড়া এ পরিমাণ রোজা রাখতে অন্য কোন মাসে দেখিনি। যে পরিমাণ শাবান মাসে রাখেন। (উত্তরে) রসূল (সঃ) ফরমান, এটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী একটি মাস, যে মাসের ফজীলত থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকে। অথচ এ মাসে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমি রোজা অবস্থায় আমার আমল পেশ করাকে ছন্দ করি বিধায় রোজা রাখছি। (নাসায়ী শরীফ)

তিনি বলেন, রসূল (সঃ) শাবান মাসের তুলনায় অন্য কোন মাসে এত বেশী (নফল) রোযা রাখতেন না। তিনি পূর্ণ শাবান বর্ণনান্তরে কিছু দিন ব্যতীত পুরো শাবানে রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল (সঃ) শাবান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখতেন তাই হুজুরের উম্মত হয়ে আমাদেরও এই মাসে বেশী বেশী রোযা রাখা দরকার তবে শাবান ২৭, ২৮, ২৯ এ তিন দিন রোযা সঙ্গত কারণে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মাসে ১৩, ১৪, ১৫ এ তিন দিন রোযা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন:

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রঃ) বলেনঃ রসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু দাউদ শরীফে হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

রসূল (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আইয়ামে বীজের রোযা রাখতে (আর তা হল প্রত্যেক মাসের) তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখের রোযা।
(আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ)

এ হাদিসদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখ রোযা রাখার নির্দেশ সহীহ হাদিসে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। শাবানের পঞ্চদশ দিনে রোযা রাখা অত্যন্ত ছাওয়াবের

কারণ।

তদুপরি আমরা ইবনে মাজা শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আলী (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত কর এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। এ হাদিসটি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট শাবানের পঞ্চদশ দিনের রোযা রাখার ব্যাপারে বর্ণিত।

উল্লেখ্য যে, পূর্বে এ হাদিসের পর্যালোচনায় বলা হয়েছিল যে, হাদিসটি জাল কিংবা অত্যাধিক দুর্বল নয়। শুধু রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদিসটিকে কিছুটা দুর্বল বলা হয়েছে। আর কোন আমলের ফযীলত প্রমাণে এ ধরণের হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এর কারণে ফকীহগণ শাবানের পঞ্চদশ দিবসে রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলে সাব্যস্ত করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

শবে বরাতে রসূলের দীর্ঘ সিজদায় নফল নামায আদায়:

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ শুআআবুল ঈমানে আলা ইবনে হারেস (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন:
হযরত আলা ইবনে হারেস (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে উঠে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন, আমার এ ধারণা হলো যে, তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছে। আমি এ অবস্থা দেখে উঠে গেলাম এবং তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নাড়া দিলাম। সেটা নড়ে উঠল। (তখন) আমি ফিরে আসলাম যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠালেন এবং নামায হতে অবসর হলেন, তখন বললেনঃ হে আয়েশা! অথবা হে হুমায়রা! তুমি কি এ ধারণা পোষণ কর যে, (আল্লাহর) নবী তোমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন? আমি (বিনীত কণ্ঠে) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম বিষয়টি এমন নয়। প্রকৃত বিষয় হলো আমার ধারণা হলো আপনার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। কারণ আপনি সিজদা অনেক দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বললেন, জান, এটি কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী। আল্লাহ তাআলা এ রাতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, ক্ষমা প্রার্থীদের ক্ষমা করেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন। তাদের বিষয়টি মূলতবী রাখেন।

(বায়হাকী শুআবুল ঈমানে এ হাদিসটি বর্ণনা করতঃ বলেছেন এটি মুরসাল ও জায়্যিদ খঃ ৩, পৃঃ ৩৮২)

প্রায় একই রকমের হাদিস বাইহাকী শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত সে হাদিসে রসূল (সঃ) এ রজনীতে যে নামায পড়েছেন এবং দীর্ঘ সেজদায় পড়ে ছিলেন এবং সেজদা রত অবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া করেছেন সেই কথাও উল্লেখ রয়েছে। (শুআবুল ঈমানঃ খ-৩, পৃ-৩৮৪)

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় থেকে রসূলের কয়েকটি আমল প্রমাণিত হয়:

১। এ রাতে রসূল (সঃ) বেশী বেশী নফল নামায আদায় করেছেন।

২। দীর্ঘ সেজদার মাধ্যমে স্বীয় প্রভূকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

৩। শবে বরাতের যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

৪। আল্লাহর নিকট দয়া, দোআ-প্রার্থনা করেছেন।

৫। গুনাহগারদের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং অনুগ্রহ প্রার্থনাকারীকে অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

তাই এ রজনীতে প্রত্যেক রসূল প্রেমিকের জন্য উপরোক্ত কাজ ও আমলগুলো আঞ্জাম দেয়া সঙ্গত কর্তব্য।

শবে বরাতে দু'আ ও তওবার মাধ্যমে গুনাহের মার্জনা:

হযরত আয়েশা (রঃ) কর্তৃক রসূল (সঃ) এর শবে বরাতে কবরস্থান গমণ এবং সেখানে রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গে একটি লম্বা হাদীছের একাংশে বর্ণিত আছেঃ

“অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ) বললেনঃ হে আয়শা! তুমি কি আমাকে আজকের রাতে নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করার অনুমতি দিবে? আমি (আয়শা) বললামঃ নিশ্চয়ই; আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হউক। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সময় (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকার পর দীর্ঘ একটা সিজদা করলেন। এমনকি আমার ধারণা হলো, তিনি ওফাত পেয়ে গেছেন। আমি তাকে স্পর্শ করার ইচ্ছা করলাম এবং তার পায়ের তলায় হাত রাখলাম তখন সামান্য স্পন্দন অনুভব হল। আমি আনন্দিত হলাম আমি তাকে সেজদা অবস্থায় এই দোআ পড়তে শুনলাম।

اعوذ بعفوك من عقا بك وأعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك

'হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই। তোমার করুণা দ্বারা আশ্রয় চাই তোমার ক্রোধ হতে। তোমার দিকেই ধাবিত হই। তুমি এমন, যেমন তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।' সকালে (যখন) আমি তাঁর সাথে আলোচনা করলাম তখন তিনি বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি এই দোয়া মুখস্থ করবে? আমি বললামঃ অবশ্যই। তিনি বললেন: শিখে নাও। আমাকে এই কলিমাগুলো জিবরাইল (আঃ) শিখিয়েছেন এবং সেজদা অবস্থায় এটি বার বার পড়তে বলেছেন(বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪, হাদীছটি দুর্বল তবে অন্যসূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে।)

শবে বরাতে প্রভূর দরবারে দুআ ও প্রার্থনা করার ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হলো।

হাদীছটি ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আয়শা কর্তৃক বর্ণনা করেছেন যার আংশিক বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো:

“এক রাতে রসূল (সঃ) নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তিনি সেজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন...অতপর আমি কান পেতে শুনতে পেলাম যে, তিনি সিজদারত অবস্থায় এই দুআ করছেন

اعوذ بعفوك من عقا بك وبرضاك من سخطك اعوذ بك منك اليك لاأحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠালেন এবং নামায হতে অবসর হলেন তখন তিনি বললেনঃ হে আয়শা ! তুমি কি ধারণা করেছ যে, আল্লাহর রসূল (সঃ) তোমার অধিকার হরণ করেছেন? অতঃপর রসূল (সঃ) বললেন, হে আয়শা! তুমি কি জান এটা কোন রজনী? হযরত আয়শা (রঃ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। রসূল (সঃ) বললেন: এটি শাবানের ১৫ তারিখের রাত। এ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করা হয়। দয়া প্রার্থীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়। তবে বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়।“ (বায়হাকী শুআবুল ঈমানঃ খ-৩, পৃ-৩৮৪)

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল (সঃ) শবে বরাতে দীর্ঘ সময় ধরে দুআ ও প্রার্থনারত থাকতেন। তাই রসূল প্রেমিকদের কর্তব্য এ পবিত্র রজনীতে দুআ ও প্রার্থনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করা।

শবে বরাতে নবীজীর (সঃ) কবরস্থান গমন:

শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে রসূল (সঃ) জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থানে গমন করা এবং সেখানে সকল কবরবাসীর উদ্দেশ্যে দোয়া করার প্রমাণও হাদীছে পাওয়া যায় বিধায় এ আমলকে ফক্বীহগণ শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ মর্মে হযরত আয়শা (রঃ) হতে একাধিক হাদীছ বর্ণিত আছে সূত্রের দিক দিয়ে হাদীছগুলো দুর্বল হলেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা কমপক্ষে ফজীলত অর্জনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। নিম্নে একটি লম্বা হাদিসের আংশিক তুলে ধরা হলো:

হযরত আয়শা (রঃ) বর্ণনা করেন রসূল (সঃ) আমার নিকট আগমন করলেন এবং স্বীয় (অতিরিক্ত) পোশাক খুলে ফেললেন। কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতেই পুনরায় তিনি পোশাকটি পরিধান করে নিলেন। আমার ধারণা হলো তিনি স্বীয় পূতপবিত্র পত্নীগণের মধ্য হতে অন্য কারো নিকট চলে যাচ্ছেন। এ কারণে আমার খুবই আত্নমর্যাদাবোধ হলো আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। যেয়ে দেখি তিনি জান্নাতুল বাকীতে মুসলমান নরনারীদের জন্য দোয়া ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আমি মনে মনে বললামঃ তাঁর উপর আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাজে লিপ্ত আর আমি (আয়েশা) পার্থিব কাজে মগ্ন। আমি সেখান হতে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করলাম, (এই আসা যাওয়ার মাধ্যমে) আমার শ্বাস স্ফীত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী করীম (সঃ) (আমার কক্ষে) আগমন করলেন এবং (আমার) শ্বাস স্ফীত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি (বিনীত স্বরে) বললাম আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হোন। আপনি আমার নিকট আগমন করলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয়বার পোশাক পরিধান করে নিলেন। আমার এই ধারণার ফলে কঠিন ঈর্ষা হলো যে, আপনি অন্য কোন পবিত্র পত্নীর নিকত চলে যাচ্ছেন কি না। ঘটনা এ পর্যায়ে পৌছল আমি নিজেই বাকীয়ে গরকদে গিয়ে যা দেখলাম আপনি কি করছেন। তিনি বললেনঃ হে আয়েশা তোমার কি এ ধারণা ছিল যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার ক্ষুন্ন করবেন ? আসল কথা হলো জিবরাইল (আঃ) আমার নিকট এসে বললেনঃ এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী এবং মহান প্রভূ এই রাতে অনেক লোককে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দেন যার সংখ্যা কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। (অবশিষ্ট হাদীছ অনুবাদসহ পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে) (শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪)

এ ধরণের আরো কতক হাদিস দ্বারা শবেবরাতে রসূল (সঃ) কবরস্থানে গমন ও সেখানে মৃতদের জন্য দোয়া করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই রসূলপ্রেমিক ভাইদের জন্য শবে বরাতে কবর যিয়ারত করা এবং নিকটাত্নীয়দের জন্য বা যে কোন মুসলমানের জন্য কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইখলাছ, তাকাছুর ইত্যাদি সূরা পড়ে কবরবাসীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা অন্যান্য আমলসমূহের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম আমল।

কবরস্থানে গমণ প্রসঙ্গে আয়শা (রঃ) এর হাদিসের একটি ব্যাখ্যা:
হযরত শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) কর্তৃক একটি অতি মূল্যবান ফিকহী উসূল বর্ণিত আছে যা নিম্নরূপঃ

" মূলকথা হলো রসূল (সঃ) এর কৃতকর্ম দুই ধরণের হয়ে থাকে

১। যা রসূল (সঃ) রীতিমত করতেন বা অধিকপরিমাণে করতেন অথবা তা পালনকরার নির্দেশ দিয়েছেন

২। কিছু কাজ আছে যা রসূল (সঃ) হঠাৎ কখনো কখনো করেছেন বলে প্রমাণিত, কিন্তু নিয়মিত বিরামহীন করেন নি বা অন্যদেরকে তা পালন করার প্রতি উৎসাহিত করার প্রমাণ নেই। কাজেই এ দুই প্রকারের প্রত্যেকটিকে তার যথাযথ স্থানেই রাখা বাঞ্চনীয়। প্রথম প্রকারের উপর গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত পালন করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আমলকে যথাস্থানে রাখার উপায় হলো মাঝে-মধ্যে তা করে নেয়া যেমন রসূল (সঃ) করেছিলেন। এটাকে নিয়মিত রুটিন বানিয়ে নেয়া উচিত নয়। "

উক্ত নীতিমালার আলোকে হযরতুল আল্লাম মুফতী তাকী উসমানী (দাঃ বাঃ) বলেন যে, শাইখুল হিন্দের উপরোক্ত নীতিমালাকে আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী শফী (রহঃ) বহু মাসআলার মধ্যে বাস্তবায়ন করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, শবেবরাতে কবর যিয়ারত। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, হুজুর (সঃ) বাকীতে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করেছেন, তাই সাধারণতঃ ধারণা করা হয় প্রত্যেক শবে বরাতে কবরস্থান যিয়ারত সুন্নাত। কিন্তু আমার পিতার বক্তব্য ছিল যে, প্রতি শবে বরাতে নিয়মিত কবরস্থানে ছুটে যাওয়া সুন্নাত নয়। যদিও জায়েয। তবে মাঝে মধ্যে কোন কোন শবে বরাতে কবর যিয়ারতে চলে যাওয়া এটা সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। কেননা রসূল (সঃ) তাঁর জীবনে একবারই কবর যিয়ারতে গিয়েছিলেন শবে বরাতে, (নিয়মিত) যাওয়া রসূল (সঃ) ও কোন সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। এটাই উল্লেখিত হাদীছে আয়শার সঠিক ব্যাখ্যা বলে মনে হয়।

শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়ঃ

হযরত আলা ইবনুল হারিস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সেজদা করেন যে, আমার ধারণা হল তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তার বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সেজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন তখন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা অথবা বলেছেন, ও হুমাইরা, তোমার কি এই আশংকা হয়েছে যে,

আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সেজদা থেকে আমার এই আশংকা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন ইরশাদ করলেন,

هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عزو جل يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرينويرحمالمشترحمين ويؤخر اهل الحقد كماهم

'এটা হল অর্ধ শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তার বান্দার প্রতি মনযোগ দেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষ পোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই।' [শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২-৩৬৮]

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন,

هذا مرسل جيد

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ রাতে দীর্ঘ নফল পড়া, যাতে সেজদাও দীর্ঘ হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বই-পুস্তকে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে অর্থাৎ এত রাকআত হতে হবে, প্রতি রাকআতে এই সূরা এতবার পড়তে হবে - এগুলো ঠিক নয়। হাদীস শরীফে এসব নেই। এগুলো মানুষের মনগড়া পন্থা। সঠিক পদ্ধতি হল, নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকআত করে যত রাকআত সম্ভব হয় পড়তে থাকা।

কুরআন কারীম তেলওয়াত করা। দরূদ শরীফ পড়া। ইস্তেগফার করা। দুআ করা এবং কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমানো। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হল না।

পরদিন রোযা রাখা:

সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله : (()) إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ,فإن الله ينزل فيهالغروب الشمس الى سماء الدنيا ,فيقول : ألا من مستغفر فاغفر له على مستزرق فأرزقه ,ألا مبتلى فأعافيه , ألا كذا ,ألا كذا ,حتى يطلع الفجر

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, জ্ঞপনের শাবানের রাত (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত) যখন আসে তখন তোমরা এ রাতটি ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। কেননা, এ রাতে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে আসেন এবং বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দেব। এভাবে সুব্‌হে সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তাঞ্চআলা মানুষের প্রয়োজনের কথা বলে তাদের ডাকতে থাকেন।ঞ্চ [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪]

এই বর্ণনাটির সনদ যয়ীফ। কিন্তু মুহাদ্দিসীন কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া শাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং আইয়ামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিষয়টিও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বলা বাহুল্য, পনের শাবানের দিনটি শাবান মাসেরই একটি দিন এবং তা আয়্যামে বীযের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য ফিক্‌হের একাধিক কিতাবেই এদিনে রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনূন লেখা হয়েছে। আবার অনেকে বিশেষভাবে এ দিনের রোযাকে মুস্তাহাব বা মাসনুন বলতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ত্বাকী উসমানী (দাঃবাঃ) তার ইসলাহী খুতুবাতে বলেন, ‘আরো একটি বিষয় হচ্ছে শবে বরাতের পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনের তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসুলের বিশাল ভান্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, -শবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ।‘ সনদ বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে দেওয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতে অনুচিত।’

তবে হ্যাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, রমযানের দুএকদিন পূর্বে

রোযা রেখো না।ঞ্চ যাতে রমযানের পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।
একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, শাবানের এই ১৫ তারিখটি তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভূক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের আইয়ামে বীয এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এই দুটি কারণকে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা আইয়ামে বীয এর অন্তর্ভূক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই সে প্রতিদান লাভ করবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নাত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও আইয়ামে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যে কোন দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে তরে ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, রোজা রাখার ব্যাপারে এ মাসের নির্দিষ্ট কোন দিনের পৃথক কোন বৈশিষ্ট নেই।

যেহেতু রাতটিতে মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর বিশেষ রহমত দান করেন এবং গুনাহগারদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা হয় বিধায় মুসলমানদের উচিত এমন রহমত ও বরকতপূর্ণ রাতকে গণীমত মনে করে স্বীয় প্রভূর দরবারে বেশি বেশি তওবা-ইসতিগফার করা। নিত্যনতুন বিদআত ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থেকে প্রশান্তিচিত্তে ইবাদত করবে। নফল নামায কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ শরীফ বিভিন্ন দু'আসমূহ সব ধরণের মাসনুন ইবাদতই এ রাতে করা যাবে।

যেমন: আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার আশশারাম্বুলালী (রহঃ) বলেন:

" রাত্রি জাগরণের তাৎপর্য এই যে, এ রাতের অধিকাংশ সময়ে, কারো কারো মতে কিছু অংশে কোরআন হাদীছ পড়া অথবা শুনানো কিংবা তাসবীহ পড়া বা দুরূদ পাঠ করার মাঝে লিপ্ত থাকবে। "

এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ রাতে জাগ্রত থাকার জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি এবং বিশেষ কোন ইবাদত কিংবা বিশেষ পদ্ধতির কোন নামায শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয় নি। এবং বারো রাকাআত কিংবা ষোল রাকআত সম্পর্কে যে জনশ্রুতি আছে

ইসলামী শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই। রাতটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এ ধরণের বিশেষ পদ্ধতির নামাযের ফজীলত সংক্রান্ত যে সব বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া হয় এ সব নিজেদের পক্ষ থেকে বানানো ও মনগড়া এবং ভিত্তিহীনও বটে।

এজন্যই আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭ হিঃ) বলেন: " উক্ত রাতে যে সব নামায আদায়ে যথাক্রমে প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং যা জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করেছে অথচ তার কোন ভিত্তি নেই। "

তার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করে পরিশেষে তিনি রায় প্রদান করেন যে:

" এটি এমন হাদিস যার জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তার তিনটি স্তরের প্রসিদ্ধ রাবিগণ অজ্ঞাত। তার মধ্যে দুর্বল রাবীও আছে। তাই হাদীছটি অবশ্যই অকল্পনীয়। "

রাত্রে জাগরণ করে নির্জনে ইবাদত করা:

শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা একটি মুসতাহাব আমল যা পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসতাহাব আমলকে তার পর্যায়েই রাখা উচিত। তার নির্দিষ্ট পর্যায় থেকে অগ্রসর হয়ে ওয়াজিব তথা আবশ্যকতার স্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই বরং বিদআত। অপরদিকে এ রাতে একাকী ইবাদত করা উত্তম। এর জন্য মানুষকে মসজিদে দলবদ্ধ করা, দলবদ্ধতার সাথে এ রাতে ইবাদত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অন্যকেও অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেয়া, শবীনা ইত্যাদির আয়োজন করা ফুকাহায়ে কেরাম পছন্দ করেন নি। বরং বিদআত বলেছেন।যথা: ইতিপূর্বে ফিক্বহে হাম্বলীর প্রসিদ্ধ ফক্বীহ শায়খ মানসূর ইবনু ইউনুস আল বাহুকী (রহঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ

" ... তবে মসজিদে রাত জেগে দলবদ্ধভাবে এ রাতে ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্র হওয়া বিদআত। "

ফিক্বহে হানাফীর অভিজ্ঞ আলিম ইবনু নুজাইম (রহঃ)ও প্রায় এরূপ বলেছেন, তিনি বলেনঃ " উল্লেখিত ফজীলতময় রাতসমূহে রাত জেগে ইবাদত করার নিমিত্তে বিভিন্ন মসজিদে দলবদ্ধ হওয়া মাকরূহ। মসজিদ হোক বা অন্যত্র কেননা রসূল (সঃ) করেন নি, সাহাবায়ে কিরামও করেন নি এবং আহলে হিজাযও করেন নি। যাদের মধ্যে ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ এবং ইবনে আবী মুলাইকার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলেমও রয়েছেন। তা ছাড়া মদীনার ফকীহগণ এবং ইমাম মালিক (রহঃ) এর শাগরিদগণ দলবদ্ধতার সাথে সমবেত হয়ে যিকির আযকার করাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। "

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) দলবদ্ধতার সাথে মসজিদে জমায়েত হয়ে শবেবরাতে ইবাদত করা সম্পর্কে ওলামায়ে আহলে শামের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন। ১। একত্রিত হয়ে দলবদ্ধতার সাথে ইবাদত করা এ রাতে বৈধ ও জায়েয। ২। এগুলো কিছুই বৈধ নয় বরং মাকরূহ।

এ মতদ্বয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় মত তথা মাকরূহ হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন:

" দ্বিতীয় হলো শবে বরাতে মসজিদে কোন বিশেষ নামায, ওয়ায, দু'আ এর জন্য একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থাপনা (গুরুত্ব সহকারে) মাকরূহ। অবশ্য যদি কেউ একাকী ঐ মসজিদে তার নামায আদায় করে তা মাকরূহ হবে না। এটা ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এর উক্তি। যিনি শিরিয়ার ইমাম ফক্বীহ ও বড় আলেম। আর এই মতটি সঠিক হওয়ার বেশি নিকটবর্তী ইনশাআল্লাহ। "

তাই মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত, যিকির-আযকার করা অবশ্যই উত্তম কাজ। চাই নির্জনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। জনসমক্ষে হোক কিংবা একাকী। কিন্তু সমবেত হওয়ার প্রতি অতি গুরুত্বালোপ এবং তার আনুষ্ঠানিকতা না করাই চাই। (যাওয়ালুসসিনাহ আল আ'মালিস সানাহঃ পৃ - ১৭, সূত্রে ফজীলত কী রাতে)

রাতের কোন অংশে জাগ্রত থাকা উত্তম:

এ ব্যাপারে হযরত থানভী (রহঃ) হাক্কীকতে ইবাদত (পৃঃ ৪৬৬) গ্রন্থে যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো নিম্নরূপ:

কুরআনে কারীমের আয়াত

ان ناشئة الليل هى اشد وطأ واقوم قيلا

এর দ্বারা রাতের শেষাংশে অথবা শোয়ার পর গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করা উত্তম বলে বুঝা যায়। আর হাদীছে নববী দ্বারা শেষ রাতে ইবাদত করা উত্তম বলে সাব্যস্ত। এ ব্যাপারে অনেক হাদিস হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। যাকে নুযূলে রবের হাদিসও বলা হয়। যুক্তি-প্রমাণও এর স্বপক্ষে। কারণ শেষ রাত নিদ্রার সময়। তখন নিদ্রা ত্যাগ করে ইবাদতে মগ্ন হওয়া খুবই কষ্টকর ও কঠিন। তাই এ কষ্ট উপেক্ষা করে ইবাদত করাটাই হবে উত্তম। সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়, শবেবরাতের ইবাদত শেষ রাতে করাই অতি উত্তম। কিন্তু কারো জন্য যদি শেষ রাতে জাগরণ কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে সে রাতের প্রারম্ভেই সাধ্যমত নফল ইবাদত করে নিবে। (উল্লেখ্য যে, সর্বক্ষেত্রে ইশা ও ফজর নামায অবশ্যই জামাআতের সাথে পড়তে হবে।) কারণ অন্যান্য রাতগুলিতে আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে রাতের শেষ অংশের দিকে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শবে বরাতে রাতের প্রারম্ভেই প্রথম আসমানে আগমন করেন বলে হাদীছে আছে। এ ব্যাপারে আমরা হাদীছগুলো উল্লেখ করে এসেছি। উপরন্তু কেউ যদি সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতে আগ্রহী বা সক্ষম হন তাহলে তা ভাল কথা। তবে এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে।

১। সময়কে অপচয় না করে ইবাদত, দু'আ, নামায, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে শরীয়ত সম্মতভাবে মগ্ন থাকা

২। ইশা ও ফজরের নামায অবশ্যই জামাআত সহকারে পড়ার নিশ্চয়তা থাকা।

শাবানের পনের তারিখ রোযা রাখা:

আমরা হযরত আলী (রঃ) এর বর্ণিত হাদীছে পেছনে উল্লেখ করে এসেছিলাম যে, " শাবানের পনের তারিখ রাতের বেলায় জাগ্রত থেকে ইবাদত কর এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ। "

হাদিসটি সম্পর্কে আমরা মুহাদ্দিসিনে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলাম যে, হাদিসটি জাল কিংবা অত্যাধিক দুর্বল নয়। অবশ্য একজন রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে মুহাদ্দিসিনে কেরাম হাদিসটিকে কিছুটা দুর্বল বলেছেন। আর ফাজাইলে আমাল এর ক্ষেত্রে এ ধরণের হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এর আগে আমরা মাহে শাবানে অধিক পরিমাণে রোযা রাখা, প্রতি মাসে আয়্যামে বীজ তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা তদুপরি হযরত আলী (রঃ) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের উপর সবিস্তারে আলোচনা করে এসেছি। সুতরাং পেশকৃত হাদিসগুলির আলোকে শবেবরাতের রোজা রাখা মুসতাহাব।

এ ব্যাপারে উলামায়ে উম্মত ও ফুকাহায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

১। আল্লামা যুরকানী মালেকী (রহঃ) ১৫ শাবান রোজা রাখাকে মুসতাহাব বলেছেন। তিনি বলেনঃ
" শা'বানের পনের তারিখ রাত আগমন করলে রাত জেগে থাকো তথা ইবাদতের মাধ্যমে রাতকে সতেজ করো এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্য প্রকাশার্থে প্রশান্তচিত্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করো আর দিনের বেলায় রোযা রাখ। কেননা এসব কিছু মুসতাহাব। "
২। শায়খ আলা উদ্দীন আবুল হাসান আল হাম্বলী (মৃঃ ৮৮৫ হিঃ) লিখেনঃ
" শায়খ ইবনুল জাওযী আসবাবুল হিদায়াতে বলেছেন, হারাম মাসসমূহে এবং পূর্ণ শাবান মাসে রোজা রাখা মুসতাহাব। হারাম মাসসমূহের ব্যাপারে মাজদও স্পষ্টভাবে এটাই বলেছেন এবং আরো বলেছেন শাবানের পনের তারিখের রোজা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। "
৩। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেনঃ

" শাবানের পনের তারিখ রোজা রাখা মুসতাহাব। "

৪। হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) শবে বরাতের মাসনূন আমলসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

" শবে বরাত সকালে তথা পনের তারিখে রোজা রাখ। "
৫। হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান সাহেব (রহঃ) একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন:
"শাবান মাসের কোন তারিখে দিনে রোজা রাখা ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয়। আর শাবানের তের তারিখের রোজার বিশেষ কোনো ফজীলত হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে ১৫ শাবানের রোজার কথা হাদীছ শরীফে এসেছে যে, এ তারিখে রোজা রাখো। সুতরাং ১৫ শাবানের রোজা মুসতাহাব। কেউ রাখলে ছওয়াব পাবে, না রাখলে অসুবিধা নেই।"

শবে বরাতে কবরস্থানে গমন:

হযরত আয়েশা (রঃ) এর বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, হুযুর (সঃ) উক্ত রাতে মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। অতএব, উক্ত রাতে কবরস্থানে গমন করা, মৃতদের রূহে সাওয়াব পৌছানো এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা জায়েয। বরং ফিক্বহী বর্ণনার দৃষ্টিকোণে এই রাতে কবরস্থানে গিয়ে যেয়ারত করা মুস্তাহাব অনুমিত হচ্ছে।

নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো:

১। ফাতওয়া আলমগিরীতে বলা হয়েছে:

" কবর যিয়ারতের জন্য উত্তম দিবস চারটি। সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। তেমনিভাবে পবিত্র রাতগুলোতেও বিশেষ করে বরাত রজনীতে। "

২। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উক্ত ফিক্বহী আলোচনা করতঃ এক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের ফয়সালা উল্লেখ করে লিখেন:

"... এ সমস্ত লোক কবরস্থানে গুনাহের কাজ করে কবীরা গুনাহর অধিকারী হয়ে গেছে।

কারণ কবর তো ভয়-ভীতির স্থান এবং নেক আমলের প্রতি অনুপ্রেরণাদায়ক। অথচ তারা উলটো কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো। তারা কবরকে বিনোদন ও অপরাধ সংঘটিত করার আখড়া বানিয়ে নিল। যেসব লোক চাঁদনী রাতে মিম্বর এবং চেয়ারে বসে ওয়াজ-গল্পগুজব, নারী-পুরুষের সম্মিলন ইত্যাদির মতো বিদ'আত প্রচলন ঘটিয়েছে তাদের এসব কিছু নিষিদ্ধ তথা হারাম। কবর যিয়ারতকারী পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উল্লেখিত অন্যায়ের কারণে এসব কিছুই হারাম।"

কোন কোন আলেম যেমন হযরত থানবী রহ. প্রমুখ এ রাতে কবর যিয়ারতকে মুস্তাহাব বলেছেন (এমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৩৪)। তবে আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন যে, যেহেতু নবীজী সা. জীবনে একবার শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাই যিয়ারত কখনও করবে, কখনও বাদ দিবে। গুরুত্ব, কর্তব্য ও পাবন্দীর সাথে যাবে না। এটা মূলত দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের কথা যে, বস্তু যে মানের সাব্যস্ত আছে সেটাকে সে মান ও পর্যায়ে রাখা। (শবে বরাত কী হকীকত পৃ. ৮)

শবে বরাত উপলক্ষে কবরস্থানে যাওয়া একটি মুসতাহাব আমল। তবে তার জন্য দলবদ্ধ হওয়া, একে অন্যকে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া বিদআত। স্বয়ং হুজুর (সঃ) উক্ত রাতে জান্নাতুল বাকীতে তাশরীফ নিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটি হযরত আয়শা (রঃ)ও জানতে পারেন নি। তাই মুসলমানদেরও উচিত শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে দূরে থেকে একাকী যিয়ারত করতে কবরস্থানে যাওয়া এবং মৃতদের জন্য ঈসালে ছাওয়াব করা। কিন্তু বিষয়টিকে শবে বরাতের আবশ্যকীয় আমল মনে করা যাবে না।। মোটকথা শরীয়তের যে আমল যে পর্যায়ের প্রমাণিত তাকে সে পর্যায়েই রাখা উচিত। তার থেকে আগে চলে যাওয়া শরীয়তের বিধান লংঘণ ছাড়া কিছু নয়।

সংঘটিত কিছু বিদআত ও কুসংস্কারঃ

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত শয়তানকে যখন তার গোস্তাখী ও সীমালংঘণের কারণে প্রশান্তির নির্ঝরিণী জান্নাতের নির্মল পরিবেশ থেকে তাকে বের করে দিলেন, তখন সে আদম জাতির সাথে স্পষ্ট শত্রুতার ঘোষণা করে এ মর্মে বদ্ধপরিকর হয় যে, সে আদম জাতিকে সীরাতে মুসতাক্বীম তথা সহজ সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে অন্ধকারের অতলান্ত গহবরে নিক্ষেপ করার পূর্ণ প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

কুরআন মাজীদের ভাষায়ঃ

“সে (ইবলীস) বললো, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে।”
(আলা আরাফঃ ১৬, ১৭)

বাস্তবেই শয়তানের গতিবিধি খুবই সুক্ষ্ম ও রহস্যময়। বড় সুক্ষ্ম পন্থায় সে যুগে যুগে বনী আদমের বিরুদ্ধে সব রকমের ষড়যন্ত্র করে আসছে। বনী আদমের কোন একটি দলকে শিরকের আবর্তে জট পাকিয়ে দিলে আরকটি দলকে বিদআত ও কুসংস্কারের মাঝে ঘুরপাক খাওয়ায়। মোটকথা, সব ধরণের গুনাহের উপর তার সমান দখল। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পন্থায় সে বনী আদমকে গুনাহের দিকে উৎসাহিত করে।

শবে বরাতের সময় যেহেতু মহান আল্লাহর রহমতের বারিধারা নেমে আসে, যেহেতু তিনি স্বীয় বান্দাগণকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই শয়তান এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠে যে, বনী আদমকে রহমত ও মাগফিরাতের এই নির্ঝরণী থেকে কিভাবে বঞ্চিত করা যায় ? কিভাবে তাদেরকে ইবাদত থেকে দূরে রাখা যায়? এসব জটিল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আতশবাজি, সিন্নি, আলোকসজ্জা, ইজতেমা প্রভৃতি অবশ্যই পালনীয় - এ চেতনা সে মানুষের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যেন মানুষ কুসংস্কারের জালে আটকা পড়ে এ ফজীলতময় রাতটির ফজীলত থেকে মাহরুম থেকে যায়। অবশেষে কুসংস্কারের জালে বন্দী মানুষটি তওবা করার নসীবও হারিয়ে ফেলে।

নিম্নে শবে বরাতে সংঘটিত যাবতীয় বিদআত ও কুসংস্কারের কিছু দৃষ্টান্ত এবং তার সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো।

আতশবাজী:

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এমন কিছু লোক শবে বরাতকে উপলক্ষ করে লাখো টাকা ব্যয় করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আতশবাজীর ব্যবস্থা করে থাকে। অথচ ইসলামী শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই। এটি নিতান্তই কুসংস্কার। সমূহ সমস্যা যার মধ্যে বিদ্যমান। যথাঃ
১। আতশবাজী প্রথায় বহু অর্থ সম্পদের অপচয় হয়। আর অপচয় সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে কঠোরভাবে ঘোষণা হয়েছে যে, অপচয়কারী শয়তানের ভাই।
২। এই প্রথার কারণে সময়ও নষ্ট হয়। যে সময়টুকু আতশবাজীর পেছনে ব্যয় হয় সে সময়টুকু ইবাদতে কাটালে আল্লাহ তাআলা হয়ত খুশি হয়ে যেতেন। আর সময়ের অপব্যয় করা গুনাহর শামিল।
৩। উক্ত প্রথাটির কারণে অনেক সময় অপর মুসলমান ভাই কষ্টও পান। বিশেষ করে পাড়া-প্রতিবেশীরা আতশবাজীর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শান্তিতে থাকতে পারে না। অথচ এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। যে সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।
৪। সর্বোপরি এ রাতে কিছু লোক নিরিবিলি পরিবেশে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে চান। আতশবাজীর কারণে তাঁদের ইবাদতে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে।

অতএব একজন আতশবাজ একাধারে এ জাতীয় কয়েকটি গুনাহর শিকার হয়। নিজের সময় ও অর্থ খরচ করে আল্লাহ ও রসূল (সঃ) এর অসন্তুষ্টি কিনে নেয়, অপর মুসলমানকে কষ্ট দেয়। ইবাদতকারীর ইবাদতের মাঝে বিঘ্ন ঘটায়, উপরন্ত শয়তানকে খুশি করে।

আলোকসজ্জা:

শবে বরাতের আগমণ উপলক্ষে মসজিদ, কবরস্থান ও বাসা-বাড়ীতে সীমাতিরিক্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। এর দ্বারা নিজের অর্থ অপচয় তো হয়ই উপরন্ত কাফেরদের সঙ্গে সাদৃশ্য। বিশেষতঃ হিন্দুরাই এ জাতীয় আলোকসজ্জা ও মণ্ডপসজ্জা করে থাকে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয বা হারাম। যদি কাজটি সাধারণ মুসলমান থেকে চাঁদা নিয়ে করা হয় তাহলে খেয়ানতের গুনাহও অতিরিক্ত যোগ হবে।
এ বিষয়ে নিম্নে বিজ্ঞ আলেমদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি:

১। আল্লামা ইবনু নুজাইম হানাফী বলেন:

" শবে বরাতে বিভিন্ন গলি ও বাজারে রঙ বেরঙ এর আলোকসজ্জা করা বিদআত, তেমনিভাবে মসজিদেও। "

২। ইতিহাস মন্থন করলে প্রতীয়মান হয় যে যে, এ কুপ্রথাটির সর্বপ্রথম প্রচলন বারামিকা জাতি থেকে আরম্ভ হয়েছে। যারা মূলতঃ একটি অগ্নিপূজক জাতি ছিল। মুসলমান হওয়ার পরও তারা কুসংস্কারটি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারে নি। তাদের পুরনো অভ্যাস থেকে মুসলমানদের মাঝেও প্রথাটির প্রচলন ঘটিয়ে দিয়েছে।

যথা: মোল্লা আলী ক্বারী এ সুবাদে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

" আলোকসজ্জার বিষয়টি সর্বপ্রথম বারামিকা জাতি থেকে উদ্ভাবিত। ইসলাম গ্রহণ করার পরও তারা বিষয়টি ধর্মের ভেতর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ধর্মীয় রীতি-নীতির সাথে নিজস্ব কামনাকেও জগাখিচুড়ী করে ফেলেছে। "

৩। শায়খ আলী আল মাহফুযও এরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেনঃ
“ আল্লামা আবু শামা বলেন: বিদআতীরা যা থেকে বিষয়টিকে উদ্ভাবন করেছে এবং যদ্বারা তারা দ্বীনের সীমা অংকন থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, দ্বীনের মাঝে তারা অগ্নিপূজার রীতিনীতির আদলে যেটিকে চালু করেছে এবং নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া ও আনন্দের বিষয়ে পরিণত করেছে তা হচ্ছে-শবে বরাত উপলক্ষে আলোকসজ্জা। যার সর্বপ্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে বারামিকা জাতির মাঝে। অতঃপর তারা একে মুসলমানদের মাঝেও প্রবেশ করিয়ে দেয়, মূলতঃ অগ্নিপূজাই তাদের উদ্দেশ্য।”

৪। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ
" যেসব জঘণ্যতম বিদআত ভারতবর্ষের অধিকাংশ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে তন্মধ্য থেকে রয়েছে (শবেবরাত প্রভৃতি উপলক্ষে) আলোকসজ্জা তথা বাসা-বাড়ী, দেয়াল অট্টালিকা বৈচিত্র্যময় লাইট দ্বারা সজ্জিত করা, এর মাধ্যমে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, আগুন নিয়ে আনন্দ খেলার লক্ষ্যে দলবদ্ধ হওয়া। যে গুলোর কোন ভিত্তি বিশুদ্ধ কিতাবাদীতে নেই। এ ব্যাপারে কোন দুর্বল হাদীছ কিংবা কমপক্ষে একটি জাল হাদীছও পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ ছাড়া অপরাপর (মুসলিম) এলাকাতেও এর প্রচলন নেই। হতে পারে যা প্রবল ধারণাও বটে যে, এসব কিছু ব্রাক্ষন্যবাদী প্রথা থেকে ধারকৃত। "

হালুয়া-রুটি ও মিষ্টি ইত্যাদি:

শবে বরাতের অন্যান্য রসমের মতো এটিকেও খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। কিছু কিছু মুসলমানের নিকট প্রথাটি এতই জরুরী যে, তাদের ধারণা হালুয়া-মিষ্টির আয়োজন ছাড়া শবে বরাতই হয় না। এটাও শয়তানের এক প্রকার সুক্ষ্ম কারসাজি। হালুয়া-মিষ্টি রুটির চক্করে ফেলে দিয়ে মুসলমানদেরকে ইবাদত করা থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। অন্যথায় শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হালুয়া-মিষ্টি বা অন্যান্য ভোজ আয়োজনের জন্যে শবে বরাত নয়। শবে বরাত তো জেগে ইবাদত করা এবং গুনাহগার বান্দা আল্লাহ তাআলার রহমতের শামিয়ানাতে আশ্রয় নিয়ে মাগফিরাত লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যমন্ডিত করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। যে শবে বরাতে এ বিষয়গুলো অনুপস্থিত থাকবে সে শবে বরাতকে ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন দান করে না।

- শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মাকরূহ। (ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মত এটিই। তাঁর মতে পনেরো তারিখের সাথে দু-একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামের মনগড়া নামাযের জন্যে সমবেত হওয়াও বিদআত।' -ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২

- ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর যুগে 'সালাতে আলফিয়া'-এর রেওয়াজ ছিল। লোকেরা একটি জাল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করত যে, শবে বরাতে প্রতি রাকাতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পড়ে ১০০ রাকাত নফল নামায পড়া উচিত।উক্ত রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণই জাল। (আললাআলিল মাসনূআ, ইমাম সুয়ূতী ২/৫৮-৬০; আলফাওয়াইদুল মাজমূআ, ইমাম শাওকানী ১/৭৬) আমার জানা মতে আজ কোথাও এর রেওয়াজ নেই। তবে এর স্থলে 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর বাতানো পদ্ধতির মনগড়া একটি নামায কতিপয় লোকের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে, 'মকসূদুল মুমিনীন'-এর ওই বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এর রেওয়ায়াতসমূহ সবই ভিত্তিহীন। (দেখুন, চলতি সংখ্যার প্রচলিত ভুল বিভাগ) এসব পরিহার করে এই রাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধারণ নফল নামাযের মত নফল নামায পড়া উচিত। হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই রাতের নফল হবে লম্বা, সেজদা হবে দীর্ঘ দীর্ঘ। দু রাকাত করে যত ইচ্ছা পড়া যাবে; রাকাত সংখ্যাও নির্দিষ্ট নেই; কোনো নির্দিষ্ট সূরার সীমাবদ্ধতাও

নেই। -আলআসারুল মারফূআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী ৮০-৮৫; মারাকিল ফালাহ শরহে নূরুল ইযাহ ২১৯

- লোকমুখে যে প্রসিদ্ধ আছে এই রাতে মৃত্যুর তারিখ ঠিক করা হয় তা ভুল। (তুহফাতুল আলমায়ী ৩/১১৪)
- এভাবে এ রাতে নির্দিষ্ট তরিকায় নির্দিষ্ট কোন আমল নেই। বরং যার যেভাবে সুবিধা, যতটুকু সম্ভব, যে কোন ইবাদত বা বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করতে পারবে। কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। (শবে বরাত কী হকীকত পৃ. ১১ তাকী উসমানী)
- এ রাতে স্ত্রীগমন করা নিষেধ বলে হযরত আলী রাযি. সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত আছে বলে প্রসিদ্ধ। হাদিস বিশারদগণের মতে এটি মাওযু (জাল) বর্ণনা। (আল-মাওযুআত ইবনুল জাওযী ২/১৫৫)

শবে বরাতের রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত:

এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামাযতো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যা কিছু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার কোন প্রমাণ হাদীস শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামরে যুগেও এর রেওয়াজ ছিল না। [ইক্তিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ ২১৯]

তবে কোন আহবান ও ঘোষণা ছাড়া এমনিই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে মশগুল থাকবে, একে অন্যের আমলের ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে না।

কোন কোন জায়গায় এই রেওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা ইশার পর থেকেই ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারা রাত খতমে-শবীনা হতে থাকে। উপরন্তু এসব কিছুই করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, এসব কিছুই ভুল রেওযাজ। শবে বরাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল আগেই আলোচনা করা যায়। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক না। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়,

আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় আরামেরও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের এসব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফীক দিন।

শবে বরাতেও যাদের ক্ষমা করা হয় না:

সর্বস্তরের মুসলমান ও ঈমানদার ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, রাজা-প্রজা, আলেম ও নন আলেম নির্বিশেষে সকল মুসলমানকেই আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু কতিপয় দুর্ভাগ্য, কপাল পোড়া, মারাত্নক অপরাধী এমনও আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এ রজনীতে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তারা স্বীয় কৃতকর্ম থেকে খালেস নিয়তে তওবা করে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে না আসবে। এদেরকে ক্ষমা না করার দু'টি কারণ হতে পারে:

১। তাদের ভাগ্য খারাপ হওয়ার কারণে

২। তাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণে এমন লোকের তালিকা বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনায় প্রায় ডজন খানিক পাওয়া যায়। নিম্নে হাদিসের আলোকে তাদের কিছু তালিকা উদ্ধৃত করা হলোঃ

হযরত আয়েশা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত রসূল (সঃ) গোরস্থানে গমন করা প্রসঙ্গে একটি লম্বা হাদিসের আংশিক বিবরণ এরকমঃ

রসূল (সঃ) বললেনঃ হে আয়শা! তোমার কি এই ধারণা ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার ক্ষুন্ন করবেন? আসল কথা হলো জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট শুভাগমন করতঃ বললেন এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী এবং আল্লাহ তাআলা এই রাতে অনেক লোককে (মুসলমান) জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেন, যার সংখ্যা কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। কিন্তু এই রজনীতে আল্লাহ তাআলা

(১) মুশরিক,

(২) হিংসুক

(৩) আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী

(৪) টাখনুর নীচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধানকারী।

(৫) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান-সন্তুতি।

(৬) মদ্যপ (শরাব পানকারী ব্যক্তিদের প্রতি) রহমতের দৃষ্টি দেননা (ক্ষমা করেন না) (বায়হাকীঃ খ-৩, পৃ-৩৮৪; সনদটি দুর্বল তবে অন্য সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত আছে) উপরোক্ত হাদিসে ছয়টি সম্প্রদায়ের অপরাধ অমার্জনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো একটি সম্প্রদায়ের কথা তালিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাদিসটির বিবরণ এরকম: উছমান ইবনু আবিল আছ (রঃ) নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: যখন শা'বান মাসের ১৫ তারিখ রাত আগমন করে তখন জনৈক আহবানকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান করতে থাকেন যে, আছ কি কোন ক্ষমার ভিখারী, তাকে আমি ক্ষমা করে দিবো। আছ কি কোন যাচনাকারী, তাকে আমি দান করব? এরপর যে কেউ যা চায় আল্লাহ তাআলা তাকে তাই দান করেন কিন্তু ব্যভিচারিনী এবং মুশরিক ছাড়া। (বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ খ-৩, পৃ-৩৮৩)

এই হাদিসে উপরোক্ত তালিকার সাথে যেনাকারী ও যেনাকারিনীকে যুক্ত করা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে:

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেন শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে মহান আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টিজীবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং নিজ বান্দাদিগকে ক্ষমা করে দেন, তবে দু'সম্প্রদায় ব্যতীত। ১. হিংসুক ২. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। (আততারগীব ওয়াততারহীবঃ খ-৪, পৃ-২৩৯; মুসনাদে আহমদঃ খ-৬, পৃ-১৯৮)

হাদিসটির সনদ সহীহ।

এই হাদিস দ্বারা অমার্জনীয় সম্প্রদায়ের তালিকার সাথে অন্যায় ভাবে হত্যাকারীও যুক্ত হলো। উপরোক্ত হাদিসসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, নিম্নোক্ত অপরাধী সম্প্রদায়ের অপরাধ শবে বরাতের রাতে ক্ষমা করা হবে না।

(১) মুশরিক।
(২) হিংসুক।
(৩) আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।
(৪) টাখনুর নীচে পায়জামা-লুঙ্গি পরিধানকারী।
(৫) মাতা-পিতার অবাধ্য।
(৬) মদ্যপ।

(৭) ব্যাভিচারী-ব্যাভিচারীনী।
(৮) অন্যায়ভাবে হত্যাকারী।
কোন কোন হাদিসে এ তালিকার সাথে
(৯) অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী
(১০) যাদু-টোনার পেশা গ্রহণকারী
(১১) গণক তথা গায়েবী খবর বর্ণনাকারী
(১২) এবং বাদ্য-বাজনায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকেও উপরোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম গজালীর مكاشفات القلوب কিতাবে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে উপরোক্ত তালিকার সাথে
(১৩) ফিতনাবাজ
(১৪) ফটো অংকণকারী এবং
(১৫) চুগলখোরকেও সংযোজন করা হয়েছে।
(মুকাশাফাতুর কুলুব, বাংলা অনুবাদ মুফতী উবায়দুল্লাহ)

অর্থাৎ শবেবরাতে সাধারণ ক্ষমার আওতা বহির্ভুত করা হয়েছে।
(দেখুন মাযাহেবে হক্কঃ পৃ-২০২, খ-২)

সুতরাং শবে বরাতের পূর্বেই সকল মুসলমান নবীপ্রেমিক ব্যক্তিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ হবে উপরোক্ত অপরাধসমূহের সাথে কেউ জড়িত থাকলে খালেছ মনে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করে অপরাধ ক্ষমা করানো, অন্যথায় পবিত্র শবে বরাতেও এসব সম্প্রদায়ের অপরাধ ক্ষমা করানোর কোন পথ উন্মুক্ত থাকবে না।

শবে বরাত-কেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি:

মুসলিম উম্মাহর পরিচয় হলো, এটি হলো 'উম্মাতে ওয়াসাত' তথা মধ্যপন্থী জাতি। আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তা-ফিকিরে, আমলে ও কর্মপন্থায়।
পক্ষান্তরে আরও দুটি জাতি রয়েছে। একটি 'গুলু', 'ইফরাত' তথা বাড়াবাড়ির শিকার।
অপরটি 'তাফরীত' তথা চরম শৈথিল্যের শিকার।
প্রথমটি হলো ইয়াহুদি জাতি।
দ্বিতীয়টি হলো ঈসায়ী জাতি।

এছাড়া অন্যান্য জাতিগুলো স্ব-স্ব আচরণ অনুযায়ী এ দুই জাতির অনুবর্তী।
ইফরাত ও তাফরীতের মাঝেই হলো 'সিরাতে মুস্তাকীম' তথা সরল সোজাপথ। আর ইসলামই হলো সিরাতে মুস্তাকীম। কিন্তু ইসলামের অনুসারীদের মধ্যেও অনেকেই পূর্বেকার জাতির মতো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার। একেকজন একেক মাসআলায়। কেউ আকীদায়, কেউ চিন্তাচেতনায়, কেউ ইবাদত আমলে। আবার কেউ সবগুলোর ক্ষেত্রে। কেউ এ মাসআলায়, কেউ ওই মাসআলায়। সব সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই পূর্ণ সিরাতে মুসতাকীমে রয়েছে; যারা সর্বক্ষেত্রে ইসলামের মধপন্থা অবলম্বন করে চলে। তথা কুরআন, সুন্নাহ ও জামাআোত সাহাবার নীতিতে চলে।
শবে বরাতের মাসআলায় আমাদের দেশে তিনটি অবস্থান লক্ষ করা যায়।
(১) বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন।
(২) ছাড়াছাড়ি ও সীমাসঙ্কোচন।
(৩) এতদোভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান।

প্রথমটির উদাহরণ, এ রাতকে কর্মে বা বিশ্বাসে শবে কদরের চেয়েও মহিমান্বিত করে তোলা, হালুয়া-রুটি পাকানো ইত্যাদি।
দ্বিতীয়টির উদাহরণ, 'শবে বরাত' বলতে ইসলামে কিছুই নাই। তাদের দলীল উপস্থাপন দেখে মনে হয়, যেহেতু 'শবে বরাত' নামে কুরআন সুন্নাহয় কোনো শব্দ নাই; সেহেতু এর কোনো অিস্তত্বই নেই। এটা যে বাতিল ইস্তিদলাল বাতিল এবং জঘন্য খেয়ানত।
এরা না-জানি কখন আবার বলে বসে 'নামায' 'রোযা'র অিস্তত্ব ইসলামে নেই। এবং সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করে বসে। কারণ, কুরআন সুন্নাহর কোথাও 'নামায' 'রোযা' শব্দের উেল্লখ নেই। আছে সালাত ও সিয়ামের কথা।

বস্তুত ইসলামে শব্দ কখনো কখনো মুখ্য থাকে না; বরং উিদ্দষ্ট বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়টিই সেখানে মুখ্য থাকে। নিম্নবৃত্তে 'আণ্ডা', মধ্যবৃত্তে 'ডিম', এবং উচ্চবৃত্তে 'মামলেট' । জিনিস কিন্তু একটিই। আরবীতে কুরসী, ইংরেজিতে চেয়ার, বাংলায় কেদারা, জিনিস কিন্তু একটিই। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের দেশে ইসলাম ফার্সী ও উর্দূভাষী দাঈ ও মুবাল্লিগদের মাধ্যমে এসেছে। এটা এক ঐিতহাসিক বাস্তবতা; যা খণ্ডানোর কোনো সুযোগ নেই। প্রায় আটশ বছর আমরা মুঘল শাসনাধীনে ছিলাম। যাদের রাষ্ট্রীয়ভাষা ছিল ফারসী। এরপর কিছুদিন ছিলাম উর্দূভাষীদের অধীনে। এজন্য উপমহাদেশের ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর ফার্সী ও উর্দূর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যেমনি রয়েছে তাদের অপরিসীম অবদান। বিশেষকরে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ দেশীয় ইসলামের ওপর ফার্সীর ছাপ লক্ষণীয়। যেন ঐিট ইসলামের

'ফার্সী সংস্করণ'। যে কারণে আরবীর পরিবর্তে এখানে অসংখ্য ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

নামায, রোযা'র মতো 'শবে বরাত' ও একটি খালেস ফার্সী শব্দ। শবে বরাতের মূল আরবী শব্দ হলো, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' যার বাংলা তরজমা হলো 'শাবান মাসের মধ্য-রজনী'। আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ মানুষের সহজবোধ্যতার জন্য লাইলাতুল কদরেরর অনুকরণে এেক আরবীতে 'লাইলাতুল বারাআ', ফার্সীতে 'শবে বরাত' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে শব্দের তারতম্যের কারণে মূল বিষয়টাকে অস্বীকার করে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সালাতকে আমরা নামায বলেই চিনি, সিয়ামকে রোযা বলে জানি, তাই বলে মূল নামায রোযাকে অস্বীকার করে বসবো? একথা বলা কি ঠিক হবে, ইসলামে নামায রোযা বলতে কিছু নেই?

বস্তুত, শবে বরাত এর ফযীলত সুন্নাহ ও সালাফের কাওল ও আমল দ্বারা প্রমাণিত। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বাংলার গৌরব শাইখ আবদুল মালিক হাফিযাহুল্লাহর তাহকীক হলো, শবে বরাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে এ পরিমাণ হাদীস রয়েছে; যার কারণে এেক অস্বীকার করা মুর্খতার শামিল।

শবে বরাত কেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি:

১) আমল বা আকীদায় শবে বরাতকে শবে কদরের চেয়ে মূল্যায়ন করা।

২) এ রাতে ইবাদতের জন্য মসজিদে সম্মিলিত কোনো আমলের আয়োজন করা। যেমন ওয়াজ-মাহফিল, সম্মিলিত নফল নামায, ইজতেমায়ী দুআ-মুনাজাত ইত্যাদী।

অবশ্য ঘরে পরিবেশ না-থাকলে মসজিদে একাকী ইবাদতের জন্য গমন করতে কোনো অসুবিধা নেই। এিট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৩) এ রাতকে উদ্দেশ্য করে গরু, মুরগী, হাঁস যবেহ করা এবং হালুয়ারুটি ও ভালো খাবার-দাবার পাকানো।

অবশ্য রোযাদারদের জন্য ভালো খাবার পাকাতে অসুবিধা নেই।

৪) আতশবাজি করা, ফটকা ফুটানো।

৫) মসজিদ বা ঘরদোরে অতিরিক্ত

আলোকসজ্জা করা।

৬) শবীনা বা মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা।

৭) মসজিদে মসজিদে জিলাপী, বিস্কুট, শিরনি বিতরণ করা; চাই চাঁদা করে হোক বা একক দানের মাধ্যমে হোক।

৮) প্রমাণিত নফল নামাযসমূহের বাইের নির্দিষ্ট পরিমাণে, বিশেষ নিয়মের বিশেষ ধরনের কোনো নামায পড়া।

৯) মাজারে মাজারে, মসজিদে মসজিদে ছুটোছুটি করা। সেখানে আলোকসজ্জা করা, মেলা বসানো।

১০) কবরস্থানে যাওয়াকে জরুরি মনে করা। কবরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা। ইত্যাদী।

শবে বরাত কেন্দ্রিক ছাড়াছাড়ি:

১) শবে বরাতের অস্তিত্ব ও তার ফযীলতকে অস্বীকার করা।

২) শরীয়তের সীমারেখায় অবস্থান করে অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগীকে বিদআত সাব্যস্ত করা।

৩) এ রাতে সুন্নাহ মোতাবেক আমলকারীকেও বিদআতী বা মুশরিক বলা; অথবা তাদের সমালোচনা করা।

শবেবরাত কেন্দ্রিক মধ্যপন্থা:

১) শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করা। তবে তা কোনোভাবেই শবে কদরের সমতূল্য বা তার কাছাকাছি নয়।

২) সামর্থ্য মোতাবেক সুন্নাহস্বীকৃত নফল আমল সুন্নাহ মোতাবেক আদায় করা।

৩) বাড়াবাড়িকারীদের মতো কোনো গর্হিত কুপ্রথা বা বিদআত কাজে লিপ্ত না হওয়া।

৪) ছাড়াছাড়িতে লিপ্তদের মতো কোন মন্দ আচরণ না করা।

৫) যারা অস্বীকারের কারণে নয়; বরং অবহেলা, অসতেনতা, ব্যস্ততা বা ওযরের কারণে এ রাতে আমল করতে পারছে না; তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান না করা; তাদের সমালোচনা বা তিরস্কার না করা।

উপসংহার:

ইদানীং কালে শবে বরাত নিয়ে মানুষদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ দেখা দিচ্ছে। কেউ কেউ এর ফাযাইল বর্ণনা করছেন, আবার কেউ কেউ এর অস্তিত্বকেই পুরোদমে অস্বীকার করে বসছেন। আবার কেউ কেউ আমলের নামে অনেক বিধর্মীদের রেওয়াজও অনুসরণ করছেন। উম্মতের এই করুণ অবস্থায় যেখানে আমাদের এক হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া দরকার, সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে কলহ সৃষ্টি করা এবং এ নিয়ে মাতামাতি করা উম্মতের ঐক্যের জন্য অনেক ক্ষতিকারক। তবে উম্মতের ঐক্যের পাশাপাশি, কোরআন সুন্নাহর সঠিক বুঝের অভাবে কেউ যেন কোন আমল থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়েন কিংবা আমলের নাম করে বিদআত বা শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখাও জরুরী। কারণ আমরা সবাই জানি আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। তাই ইবাদতে যাতে কম না হয় কিংবা ইবাদতে যাতে ক্রটি না হয়, এজন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে।

শবে বরাত একটি মর্যাদাপূর্ণ রাত। তবে তা কোনোভাবেই শবে কদরের সমতূল্য নয়। আমাদের সামর্থ্য মোতাবেক সুন্নাহ স্বীকৃত নফল আমল সুন্নাহ মোতাবেক আদায় করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, কোনো বিশেষপদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া নফল নামায পড়া,ইনফিরাদী ও একাকী যিকির আযকার করা,তবে এেত যেন অন্যের ঘুম বা ইবাদতে বিঘ্নতা না হয়,দুআ, মুনাজাত ও কান্নাকাটি করা, দিল নরম হওয়া ও আিখরাতের স্মরণের উেদ্দশ্যে কবর যিয়ারত করা, দিনের বেলা রোযা রাখা। তবে তা জরুরি মনে না করা, ঘরে ইবাদতের পরিবেশ না থাকলে মসজিদে গিয়ে ইবাদত করা। তবে সেটা ইজতিমায়ী বা সম্মিলিতভাবে নয়।

অন্যদিকে আমল বা আকীদায় শবে বরাতকে শবে কদরের চেয়ে মূল্যায়ন বেশি না করা, এ রাতে ইবাদতের জন্য মসজিদে সম্মিলিত কোনো আমলের আয়োজন না করা।যেমন-
ওয়াজ-মাহফিল, সম্মিলিত নফল নামায, ইজতেমায়ী দুআ-মুনাজাত ইত্যাদী। আয়োজন বা ঘোষণা ছাড়া ইমাম বা খতীব প্রয়োজনে দু'চার কথা বলে দেন, তাতে অসুবিধা নেই।

একইভাবে ঘরে পরিবেশ না-থাকলে মসজিদে একাকী ইবাদতের জন্য গমন করতে কোনো অসুবিধা নেই। এিট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।এ রাতকে উদ্দেশ্য করে গরু, মুরগী, হাঁস যবেহ করা এবং হালুয়ারুটি ও ভালো খাবার-দাবার না পাকানো উচিত। অবশ্য রোযাদারদের সেহরী-ইফতারের জন্য ভালো খাবার ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আতশবাজি না করা, ফটকা-বাজি না ফুটানো, ফানুস না উড়ানো উচিত। মসজিদ আোলাকসজ্জা না করা, শবীনা বা মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা না, মসজিদে মসজিদে যিলাপী, বিস্কুট, শিরনি বিতরণ না করা উচিত; চাই চাঁদা করে হোক বা একক দানের মাধ্যমে হোক। প্রমাণিত নফল নামাযসমূহের বাহৈর নির্দিষ্ট পরিমাণে, বিশেষ নিয়মের বিশেষ ধরনের নামায না পড়া যেমন, প্রথম রাকাআোত অমুক অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাকাআোত অমুক অমুক সূরা ইত্যাদি। এসবের কোনো ভিত্তি নেই।মাজারে মাজারে, মসজিদে মসজিদে যিয়ারত বা দুআ মুনাজাতের জন্য ছুটোছুটি না করা, কবরস্থানে যাওয়াকে জরুরি মনে না করা, কবরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন না করা,শবে বরাতের অিস্তত্ব ও তার ফযীলতকে অস্বীকার না করা, শরীয়তের সীমারেখায় অবস্থান করে অিতরিক্ত ইবাদত-বন্দেীগীকে বিদআত সাব্যস্ত না করা এবং সুন্নাহ মোতাবেক আমলকারীকেও বিদআতী বা মুশরিক না বলা; অথবা তাদের সমালোচনা না করা উচিত।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সহীহ এলেম ও সহীহ আমল করার তৌফিক দান করুন এবং কোরআন ও হাদিসের আলোকে শবে বরাত সম্পর্কে জানার ও আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

রেফারেন্স:

১. “কুরআন হাদিসের আলোকে শবে বরাত”
লেখক: মাওলানা মিযানুর রহমান সাঈদ
২. মুহাম্মাদ সাইফুদ্দীন গাযী
দারুল হিকমাহ
০৯শা'বান ১৪৪৩হিজরী
৩.শায়খ সাঈদ আহমেদ
৪. মুফতী লুৎফর রহমান ফরায়জী,
আহলে হক মিডিয়া।
৫. “উলামায়ে সালাফের উক্তির আলোকে শবে বরাত”
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক,
মাসিক আল-কাউসার
৬.”শবে বরাতের অস্তিত্ব”
শায়খ আবদুল কাদির মাসুম
৭. “হাদিসে শবে বরাত”
ওমর আহমদ, প্রধান মুফতী,
খতীব: জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ জামে মসজিদ।
তত্ত্বাবধায়ক-'উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা' বিভাগ,
ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া,
পুরানথানা, কিশোরগঞ্জ।
৮. “শবেবরাতের আমল”
মাসিক আলকাউসার, শাবান ’২৬, সেপ্টেম্বর ’০৫
৯.কিতাব- প্রচলিত ভুল
লেখক-মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম, আমীনুত তালীম, মারকাযুদ্দাওয়াহ আল ইসলামীয়া, ঢাকা ।
১০. “বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে শবে বরাত”
মুহাম্মাদ সাইফুদ্দী গাযী
১৪শা'বান ১৪৪১হিজরী
পরিমার্জন: ৬ শা'বান ১৪৪২ হিজরী